যুগশঙ্খ SUPPLI
কলকাতা
সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

অফবিট কলকাতা

এই ছবির ক্যাপশন যে যার ইচ্ছে মতো করে নিন। তবে রাজ্যের বাইরের পাঠক, যাঁরা প্রতি সপ্তাহে ‘কলকাতা’ সাপ্লির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, তাঁদের জন্য জানিয়ে রাখা— এটা কিন্তু গঙ্গার ফোটো নয়।

টিম ‘কলকাতা’

আজ থেকে শুরু হল
বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

আমার চোখে কলকাতা

চন্দ্রশেখর শীল (অভিনেতা)

কলকাতা আসলে কলকাতাই। আমার মনের শহর, স্বপ্নের শহর, জীবন, যৌবন ও বার্ধক্যের শহর কলকাতা। এ-শহর আমায় খেতে দিয়েছে, পড়তে দিয়েছে, শুতে দিয়েছে। তার ভেজা আঁচল দিয়ে আমার শরীরটাকে মুছিয়ে দিয়েছে। তার বুকে মাতৃস্নেহে আমাকে আগলে রেখেছে। তাই কলকাতা আমার মা। মায়ের বদনাম সহ্য করতে পারব না। মায়ের কাছে সব সন্তান যেমন সমান, তেমনই কলকাতাও ধনী-গরিব সবার বাঁচার শহর।

১৯৮০ সালে কলকাতায় প্রথম আসি। তার আঁচলে আশ্রয় নিয়ে কেটে গেল এতগুলো বসন্ত। কলকাতা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। অনেকে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন হয়তো তোলেন, কিন্তু প্রতিদিন হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যত সংখ্যক মানুষ কলকাতায় আসা-যাওয়া করেন এবং যত মানুষ বসবাস করেন, সেটা একটা বিশাল চাপও বটে। সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য। তবে আমরা এখন অনেক পরিচ্ছন্ন শহরে বাস করি, তেমনভাবে আর জঞ্জালের স্তূপ নেই, নেই গুটখা খেয়ে মুখ পিচকারির তৈরি করা দাগ। বিপদে একে অন্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া, অমোঘ ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব ছড়িয়ে আছে কলকাতার বুকে।

আমার ছোট ভাই পরিতোষ শীলকে নিয়ে আমাকে ঘন ঘন মুম্বই ছুটতে হতো চিকিৎসার জন্য। সেখানকার হোটেলের মালিক আমাকে বলেছিলেন ছোটভাইয়ের জন্য বড়ভাই কাজের ক্ষতি করে বারবার মুম্বই আসছেন এটা বোধহয় আপনাদের কলকাতাতেই সম্ভব। মানুষের চাহিদার কোনও শেষ নেই। একজন গৃহকর্তা যেমন তাঁর পরিবারের সব সদস্যের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারেন না, তেমনই এত বড় শহরের এত মানুষের চাহিদা নিরসন করাও পুরোপুরি সম্ভব নয়। অন্য শহরের থেকে আমার কলকাতা অবশ্যই আলাদা। এত কম পয়সার খাবার গরিব মানুষকে কেউ দিতে পারবে না। তাই কলকাতা আমার তিলোত্তমা, আমার অট্টালিকা, আমার প্রাসাদ, আমার ভুবন। এখানে আশা আছে, ভরসা আছে, ভালোবাসা আছে। হারিয়ে যায়নি স্নেহ, মমতা, ভ্রাতৃত্ববোধ। তাই কলকাতা মায়ের আঁচলেই বাঁচা ও বাঁচার সঙ্গে মরতেও চাই।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

ভদ্রলোক বনাম কৃতজ্ঞতা

সৌরভ মণ্ডল

বর্ষাকাল শুরু মানেই প্যাচপ্যাচে কাদা, একহাঁটু জল এক্কেবারে যা-তা ব্যাপার। যদিও-বা পৃথিবীর বুকে যতই অনর্থ নেমে আসুক না কেন, আমাদের মতো প্রাইভেট সেক্টরের এমপ্লয়িদের স্বঘোষিত ছুটি ঘোষণা কোম্পানির কাছে খানিকটা বাড়াবাড়িই বটে। আমি থাকি এক্কেবারে দক্ষিণপ্রান্তে, বারুইপুরে। এখান থেকে রোজ যেতে হয় দমদম। কোনওদিন নিউ গড়িয়ায় নেমে মেট্রো ধরি, তো কোনওদিন শিয়ালদহ ঘুরে বাদুড়ঝোলা হয়ে পৌঁছই অফিসে। বর্ষাকালে জামা-প্যান্টের বারোটা বেজে যায় ততক্ষণে।

আমাকে দমদম নেমে আবার অটো ধরতে হয় অফিস যাবার জন্য। একটু বৃষ্টি মানেই জল জমা, আর ব্যস— অটো ড্রাইভারদের স্বঘোষিত ছুটি। অটো না পেলেও রিকশা অবশ্য পাওয়া যায়। তবে ওই যে কথায় আছে না কারও পৌষ মাস তো কারও সর্বনাশ! এই সময়ে রিকশার ভাড়া কুড়ি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ টাকায়। এবার বুঝুন ঠ্যালা! তবে বর্ষা হোক আর যাই হোক, এটাই ভবিতব্য জেনে, মেনেও নিতে হয়।

বর্ষার এত এতসব স্মৃতির মধ্যেও এমন স্মৃতিও আছে, যা আমার মতো আদ্যোপান্ত কর্পোরেট লোককেও ভাবতে বাধ্য করে। এটা যেদিনের কথা সেদিন দমদমে প্রায় হাঁটুজল। মেট্রো থেকে বেরিয়ে রিকশাস্ট্যান্ডে যেতেই একটা জটলা দেখে আমি আর আমার সহকর্মী সুমন্তদা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কী করব দু-তিনটে রিকশা চলছে! দুজনেই ভাবলাম অফিস না গিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। কী মনে হল, জটলার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা বড় ম্যানহোলের মুখে প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেট গুচ্ছ গুচ্ছ আটকে আছে। জল পাস হচ্ছে না। মিউনিসিপ্যালিটির লোক যেমন ট্রেন ফেল করে তেমনই। তখনও এসে পৌঁছয়নি। সবাই দেখতে পাচ্ছে, বুঝতেও পারছে এই জমা

প্লাস্টিকগুলো সরিয়ে দিতে পারলেই খানিকটা জল নামবে। কিন্তু এই অফিসপাড়ায় কার দায় পড়েছে সমাজসেবা করার! অসুবিধা তো কারওর একা হচ্ছে না! হঠাৎ দুটো পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে, দেখে মনে হল পাশের বস্তি-টস্তিতে থাকে, ওরা জল ঠেলে সোজা চলে চলে গেল ম্যানহোলের মুখটার কাছে। একটা লাঠি জোগাড় করে প্রথমে জঞ্জাল সরানোর চেষ্টা করল। ব্যর্থ হয়ে দুজনেই হাত দিয়ে সেই বোতল আর প্লাস্টিক পরিষ্কার করতে লাগল। দূর থেকে তখন সবাই সাজেশন দিচ্ছে এভাবে নয় অভাবে করো। মিনিট সাতেকের মধ্যে জল নামতে শুরু করল। পাশ থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ‘এই নোংরা পচা জলে কোনও ভদ্রলোক নামবে! ওরা না হয় বস্তির ছেলে...।’ ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরে থাক ন্যূনতম কৃতজ্ঞতার ছাপও দেখলাম না কারওর চোখে-মুখে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

ঐতিহাসিক কলেজ স্ট্রিট

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও বিশেষ বই বা একসঙ্গে বেশ কিছু বইপত্র কিনতে হলে প্রথমেই যে-জায়গাটির কথা মনে পড়ে সেটি হল কলেজ স্ট্রিট। কলকাতায় অনেক রাস্তা আছে, কিন্তু কলেজ স্ট্রিট যেন শুধু রাস্তা নয়, সকলের চেনা, সকলের প্রিয় আর পছন্দের একটা নাম। সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ভরকেন্দ্রে থাকা কলেজ স্ট্রিট যেন পড়ুয়া থেকে বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ থেকে কবি-শিল্পী— সকলের কাছেই এক অস্তিত্বের পরিচায়ক।

বউবাজার ক্রসিং থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড ক্রসিং পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত রাস্তাটির নাম শোনেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। সারা দেশে এবং বিদেশেও কলেজ স্ট্রিট তার খ্যাতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এই রাস্তার চারিদিকে শুধু ভেসে বেড়ায় বইয়ের গন্ধ, বহু বছরের ঐতিহ্যের গন্ধ। বিপুল বই সাম্রাজ্য রাস্তার ধার দিয়ে। তাই আদরের নাম 'বইপাড়া'। বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা তো আছেই, ছোট ও মাঝারি প্রকাশনী সংস্থা ও দোকানগুলিও সাহিত্য, শিল্প ও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত রকম পাঠ্য বইয়ের জোগান অব্যাহত রাখে প্রতিনিয়ত। এর বাইরে কলেজ স্ট্রিটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যে কারণে তা হল পুরনো বইয়ের সম্ভার। দেশি-বিদেশি, দুষ্প্রাপ্য, সহজ রান্না থেকে দুরূহ গণিত— যে কোনও বই পেতে হলে আসতে হয় এখানকার পুরনো বইয়ের অস্থায়ী দোকানগুলিতে। আর সেগুলি পাওয়া যায় যথেষ্ট কম দামেও। বড় দোকানের সাথে সাথে ফুটপাথের এই ছোট ছোট অস্থায়ী দোকানগুলি কলেজ স্ট্রিটের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও বটে। এত বই, এত ভ্যারাইটি তাই তো কলেজ স্ট্রিট সারা ভারতে সবচেয়ে বড় বইবাজার আর সারা পৃথিবীতে বৃহত্তম পুরনো বইয়ের বাজার। আসলে বইপ্রেমীদের স্বর্গ কলেজ স্ট্রিট শুধু যে কলকাতার বইপ্রেমীদেরই টেনে আনে তা নয়, সারা ভারতের এমনকী বিদেশি পর্যটকরাও একবার এই রাস্তাকে ছুঁয়ে যান। যদিও ফুটপাথের এইসব দোকানগুলিকে এক ছাদের তলায় আনতে 'বর্ণপরিচয়' নামে একটি স্থায়ী 'বুক মল' তৈরি হচ্ছে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসনাধীন কলকাতাকে আরও ভালো করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনামাফিক কিছু রাস্তা তৈরি করা হয়। তখন অবশ্য কলেজ স্ট্রিট নামে কোনও রাস্তা ছিল না। বলা হয়, পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজসহ নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠার ফলেই রাস্তাটি ওই নামে পরিচিত হতে থাকে। তাছাড়া সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (এশিয়ার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ বলে পরিচিত) প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলি কলেজ স্ট্রিটের এক-একটি অলংকার। এতগুলি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সমন্বিত এরকম রাস্তা আর কলকাতায় তো নয়ই, অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া ভার।

২০০৭ সালে টাইম ম্যাগাজিন-এর 'বেস্ট অব এশিয়া' তালিকায় ভারতের উল্লেখযোগ্য স্থানের স্বীকৃতি পায় কলেজ স্ট্রিট। এই কলেজ স্ট্রিটের আর একটি অহংকার কফি হাউস। আড্ডা চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পীঠস্থান, যেখান না গেলে আড্ডা বা সাহিত্য সৃষ্টি কোনওটাই যেন সম্পূর্ণ হয়না। তাছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত সব খাবারের দোকান তো রয়েইছে। আর একটি দিকে কলেজ স্ট্রিট বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল এই রাস্তা বহু মিটিং-মিছিল ও রাজনৈতিক সমাবেশের সাক্ষী যাতে অনেক বরেণ্য দেশনেতাও নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজও কলেজ স্ট্রিট সমস্ত দিকে থেকে আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এমন স্ট্রিট বোধহয় খুব কমই আছে, যার প্রতি মানুষের এত আবেগ, এত নস্টালজিয়া।

বেতারের সিগনেচার টিউন ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-১১

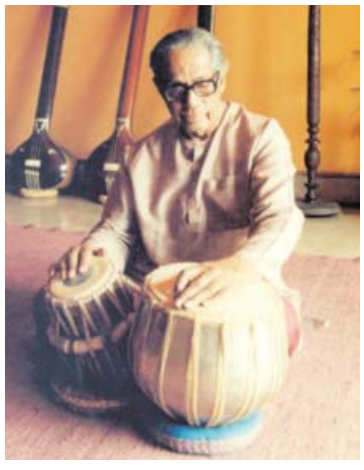

এমএ ক্লাসের পঞ্চমপত্রে পড়তে হয়েছিল একটি নতুন বিষয়। শৈলী। ক্লাস নিয়েছিলেন ড. পবিত্র সরকার। হাসিমুখে সহজ ভাষায় তিনঘণ্টার ক্লাসে খুব সরল করেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু দুঃখের কথা আমরা অনেকেই হাবুডুবু খেয়েছিলাম বিষয়টি নিয়ে। ভাবছেন শৈলীর সঙ্গে বেতারের কী সংযোগ? শৈলী-র ইংরেজি হল স্টাইল। আরও একটু ভেঙে বললে, যে মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা, আবার রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে শরৎচন্দ্রের লেখাকে আলাদা করে বোঝা যায়, তাই শৈলী। অর্থাৎ শৈলী হল এমন একটি চিহ্ন যা এককভাবে কাউকে চিনতে সাহায্য করে, আর তার নিরিখেই ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন শব্দ 'সিগনেচার'। আজও অনেকেরই কলকাতা বেতারের সেই সিগনেচার টিউন শুনেই ঘুম ভাঙে ভোরবেলা। কেউ আবার হয়তো বাড়ির দেওয়াল ঘড়িটা কিংবা হাতঘড়িটিকে মিলিয়ে নেন এই সিগনেচার টিউন শুনে। কবে তৈরি হয়েছিল, কারা তৈরি করেছিল, কবে থেকে সেটি বাজতে শুরু করেছিল, সেই সব নিয়ে আজ বলব।

ঠিক কবে থেকে এই সিগনেচার টিউন বাজতে শুরু করেছিল তা জানা না থাকলেও ধরে নেওয়া হয়, আকাশবাণীর সিগনেচার টিউনটি ১৯৩৬ সালে তৈরি হয় এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই একই টিউন বেজে চলেছে। এই সময় ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তানপুরা, ভায়োলিন, ভায়োলার (কারও মতে চেলো)-এর সাহায্যে এই সুর তৈরি করেছিলেন কে? বেতারের সিগনেচার টিউন তৈরির পিছনে দুটি নাম উঠে আসে— জন ফোল্ডস এবং ওয়াল্টার কফম্যান। আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যে বই তাতে পাওয়া যায় জন ফোল্ডস-এর নাম। পাশাপাশি অন্য তথ্যসূত্রে পাওয়া যাচ্ছে ওয়াল্টার কফম্যানের নাম।

তথ্য বলছে, এই দুই বিদেশি একই সময়ে ভারতের দুই প্রান্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বেতার কেন্দ্রে পাশ্চাত্য সংগীত বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জন ফোল্ডস ১৯৩৫ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং গবেষণার মাধ্যমে ভারতীয় লোকসংগীতের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন অনেক কিছুই। এই সময়ে তিনি তৈরি করেছিলেন একটি অর্কেস্ট্রা, যাতে অনেক ভারতীয় সুরের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। দিল্লি কেন্দ্র থেকে তিনি এই অর্কেস্ট্রা তৈরি করেছিলেন এবং খুব সাফল্যও পেয়েছিলেন। তাঁর এই সাফল্যে কলকাতা কেন্দ্রে ঠিক একই রকম অর্কেস্ট্রা শাখা খোলার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় এসে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

অন্যদিকে ওয়াল্টার কফম্যানও ১৯৩৫ সালেই ভারতে এসেছিলেন এবং প্রায় দীর্ঘ ১১ বছর এদেশে থেকে বিভিন্ন ছবি ও সংগীত সংস্থায় কাজও করেছেন। পাশাপাশি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিওর বোম্বে কেন্দ্রের ডিরেক্টর অব ইউরোপীয়ান মিউজিক পদে কর্মরত ছিলেন। একটি সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে, 'ওয়াল্টার কফম্যান ডিড কম্পোজ দ্য এ আই আর সিগনেচার টিউন নট অ্যাজ এ সিগনেচার টিউন। ইনফ্যাক্ট ইট ওয়াজ অ্যান এক্সট্র্যাক্ট ফ্রম সোনাটা কমিশনড বাই মেহলি মেহতা...।' এই দুটি নাম ছাড়াও আরও একটি নাম উঠে আসে, তিনি ঠাকুর বলবন্ত সিংহ। তবে এই তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়ে তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

এ তো গেল সিগনেচার টিউনের কথা। এবার বলি বেশ কিছু অনুষ্ঠানের কথা যার সিগনেচার টিউন (আজকের ভাষায় টাইটেল ট্র্যাক) তৈরি করেছিলেন পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। পাঁচের দশকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল গানের জন্য শুরু হয়েছিল 'লাইট মিউজিক' নামে একটি নতুন বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। 'গল্পদাদুর আসর', 'মহিলামহল', 'পল্লিমঙ্গল আসর', 'শিশুমহল', 'মজদুর মণ্ডলী', 'রম্যগীতি' প্রভৃতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সিগনেচার টিউন তৈরির কথা ভেবেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ১৯৫৭ সালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তত্ত্বাবধানে 'রম্যগীতি'-র সিগনেচার টিউন তৈরি হয়। বছর দুই বাদে ১৯৫৯ সালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল 'সংবাদ বিচিত্রা'-র টিউন।

১৯৬১ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র নামকরণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের উদ্যোগে পাঁচটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের অনবদ্য সিগনেচার টিউন বানানো হয়েছিল। ১৯৬১-র স্বাধীনতা দিবস থেকে ওই টিউনগুলি বাজতে শুরু করে। পাঁচটি টিউন হল— 'শিশুমহল', 'গল্পদাদুর আসর', 'মহিলামহল', 'মজদুরমণ্ডলী' এবং 'পল্লিমঙ্গল আসর'। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ছাড়া সহযোগী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্যামল বসু, অলোকনাথ দে, আলি আহমেদ হোসেন, সুরেন পাল, প্রিয়লাল চৌধুরী প্রমুখ। সব থেকে বড় কথা, প্রত্যেক সিগনেচার টিউনের একটি অনাবিল আকর্ষণ ছিল, তাই আজও সেইসব সুর কানে আসলে আমরা নস্টালজিক হয়ে যাই।

অনুষ্ঠানের নামের সঙ্গে, কিংবা অনুষ্ঠানের ফ্লেভারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটা টিউনের সুর সংযোজনের কথা ভেবেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। আরও একটি অনুষ্ঠানের কথা তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে যা আজ বিলুপ্ত। ওই ১৯৬১ সালেই কলকাতা বেতারের সারা সপ্তাহের বাছাই করা অনুষ্ঠান নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'প্রতিধ্বনি' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান। শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানেরও সিগনেচার টিউন বানিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সঙ্গে সিগনেচার টিউনটিও আজ লুপ্ত।

আরও একটি অনুষ্ঠানের কথা বলতে ইচ্ছে করছে, যা আজ আর শোনা যায় না। 'রম্যগীতি'। অনল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এক সময় রেডিওতে ছড়ার গান করেছেন। তাঁর গানের সুর মূলত রাগপ্রধান, কিংবা লোকসংগীতের ছোঁয়াও কখনও কখনও দেখা গেছে। তবে তাঁর গানের ছন্দ কাটা কাটা নয়, একটু স্ট্যাকাটোধর্মী অথচ পশ্চিমি প্রভাব মুক্ত। সেই সময়কার জনপ্রিয় রম্যগীতি আজ আর শোনা যায় না। সেইসব গান যদি বেসিক ডিস্কেও ধরে রাখা সম্ভব হতো তাহলে আজ পণ্ডিতজির সেই সব গান শুনে বোঝা যেত তাঁর গানের সুরের বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, স্বাতন্ত্রতাকে।

কালের গর্ভে সমাধি ঘটবে অনেক কিছুরই, কিন্তু তারা সবাই থাকবে স্মৃতির ঘরে। তাই প্রবীণ-নবীনের সম্মেলনে বারে বারে উঠে আসবে সেইসব প্রসঙ্গ। তেমনই কোনও এক প্রসঙ্গের অলিন্দে কথা হবে আগামী পর্বে।

একুশে শ্রাবণের রাত

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

সন্ধে থেকে বৃষ্টিতে ছেয়ে রয়েছে শহর। মেঘ ডাকছে। ৬ নম্বর জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরবাড়ির ছাদ-অলিন্দ ভিজছে অবিরাম। বাড়ির দরজায় শ্রাবণের মেঘমালার মতো ভিড় করে দাঁড়িয়ে মানুষের ঢল। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজছে হাজার হাজার মানুষ। কত দূর দূর থেকে মানুষ এসেছেন। তাঁরা সকলে একটি খবর জানতে চান। কেমন আছেন তিনি? কেমন আছেন কবি? কথা বলছেন? খেতে পারছেন?

না তিনি ভালো নেই। চোখ মেলে তিনি চাইতে পারছেন না আর। হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আসছে।

এই বাড়িতেই একদিন তিনি পৃথিবীর আলো দেখেছেন। প্রথম কথা বলেছেন। সে কতদিন আগেকার কথা।

কিশোর রবি এই বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের নিয়ে বলত। সে ছাদ থেকে দেখাত। ওই যে শুকতারা। ওটা আসলে কিন্তু শুক্রগ্রহ, পৃথিবীর খুব কাছের একটা গ্রহ।

রবীন্দ্রর মা চলে গেলেন। রবীন্দ্র পূর্ণ আশ্রয় পেলেন নতুন বউঠান কাদম্বরীর পক্ষছায়ায়। কত কত স্মৃতি আজ রবীন্দ্রর দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জীবনস্মৃতির শেষ পাতাটি আজ লেখা হচ্ছে দ্রুত। ঘনিয়ে আসছে সময়।

কবি অপারেশন করাতে চাননি। তিনি তাঁর মত বলে দিয়েছিলেন খুব সহজ আর স্পষ্ট করে। যেতে হবে তিনি বুঝে গিয়েছেন। আর যেতেই যখন হবে তাহলে আবার অযথা এই জীর্ণ রোগজর্জর শরীরটাকে নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করে লাভ কী? এমনিতেই তো যথেষ্ট যন্ত্রণা পাচ্ছেন তিনি। আবার নতুন করে আরও যন্ত্রণার আয়োজন করবার কি কোনও প্রয়োজন আছে– এটাই ছিল নিজের অস্ত্রোপচার নিয়ে কবির অভিপ্রায়।

ডাক্তার নীলরতন সরকার কবির কথায় সায় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন কবির শরীর অপরেশনের ধকল নিতে পারবেন না। ওঁর শরীর অতি দুর্বল। এখন অস্ত্রোপচার না করাই ভালো।

কিন্তু ডা. বিধানচন্দ্র রায় বললেন, 'অস্ত্রোপচার এখুনি না করলে দু-একদিনের মধ্যে হঠাৎ মারা যাবেন তিনি।' কবির আত্মীয়-পরিজনরা ভয় পেয়ে গেলেন।

শুরু হল অপারেশনের প্রস্তুতি।

কবি এমনিতেই অতি স্বল্প আহার করেন। অপারেশন হবে যখন থেকে ঠিক হল কবির সেই স্বল্প আহারও বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু জল বার্লি দেওয়া হতে লাগল। মাঝে মাঝে তাও বন্ধ করা হল। কারণ কবির হেঁচকি তোলা রোগ একেবারে শৈশব থেকে। জীবনের উপান্তে এসে রোগটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে। কোনও খাবার খেলে শেষে যদি অপারেশনের সময় হেঁচকি ওঠে!

অস্ত্রোপচার হবার চার-পাঁচদিন আগে থেকেই তাই কবির খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেল ডা. বিধান রায়ের নির্দেশে।

শুধু সকাল-বিকেল চলতে লাগল গ্লুকোজ ইনজেকশন। কবির রক্তে হু হু করে চিনির মাত্রা কমে যাচ্ছে। এদিকে আসন্ন অস্ত্রোপচারের কথা মাথায় রেখে খাবার দেওয়া বন্ধ রয়েছে। খাবারের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে ওই গ্লুকোজ ইনজেকশন।

চেয়ারে ঠিকমতো বসতে পারেন না কবি। তবু তিনি রোজ একটু একটু লেখেন। লিখে আর তাঁর কোনও শিরোপা বা করতালি পাওয়া হবে না। তাঁর শরীর লেখার সঙ্গে সায় দেয় না, তবু কবির কলম থামে না।

তিনি স্মিত হেসে বলেন, যে তাঁর কলম এই শেষবেলাতেও তাঁকে খাটিয়ে নিচ্ছে। মরণ ছাড়া এই লেখার হাত থেকে তাঁর ছুটি নেই।

আসলে যাঁরা খুব কাজের মধ্যে থাকেন আজীবন, চূড়ান্ত অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁদের কাজের অভ্যেস, কাজের উৎসাহ তাঁদের সঙ্গ ছাড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের শরীর দুর্বলতর হয়েছে মন এতটুকু যেন বিচলিত নয়। তিনি তখন লিখছেন, 'প্রথম দিনের সূর্য সত্তার নূতন আবির্ভাবে / প্রশ্ন করেছিল কে তুমি/ পায়নি উত্তর/ বৎসর বৎসর চলে গেল/ দিবসের শেষ সূর্য, শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে/ নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/ কে তুমি/ উত্তর পেল না?'

তাঁর জীবনের সূর্যাস্ত ঘটছেই সেটা যে তিনি জেনে গিয়েছেন, এই কবিতায় তা সুস্পষ্ট।

নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত চর্চা করতেন রবীন্দ্রনাথ। শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রভূত।

একবার এক সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি তখনই বাংলা ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় কবি। এদিকে সেই সভার পক্ষ থেকে লিফলেটে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লেখা হয়েছে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে।

কবির একসময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সত্যিই খুব দখল ছিল।

তিনি নাড়ির গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারেন নিজেও।

তিনি এবারেও বুঝতে পারছেন যে তাঁর আর সময় নেই। তিনি তাঁর চিকিৎসকদের বলছেন, 'অপারেশন নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছিনে আমি। কারণ, তোমাদের সব চেষ্টা যখন জলে যাবে তখন তো আর দোষ দেবার জন্যে আমাকে পাবে না।'

আবার অপারেশনের দু-একদিন আগে থেকে ঘন ঘন জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'আমাকে বুঝিয়ে বলো ঠিক কী ঘটতে চলেছে। আমার ঠিক কতখানি লাগবে।'

৩০ জুলাই ১৯৪১।

জোড়াসাঁকোর তিনতলার বারান্দাটাকে ঘিরে বানানো হল অস্থায়ী অপারেশন থিয়েটার। সকলে মুখে মুখে বললেন দুটি কবিতা। তাঁর কাছে এখন রথী নেই, পুত্রবধূ প্রতিমা নেই। মেয়ে মীরা কাছে থেকেও অনেক দূরের একটা ঘরে বসে রয়েছে। আর মাধুরীলতা, শমী, রেণু তাঁর এই তিন ছেলেমেয়ে বহুদিন আগে চলে গিয়েছে না ফেরবার দেশে। তিনি পুত্রবধূ প্রতিমার জন্য মুখে মুখে বলে একটি চিঠি লেখালেন সেবিকাদের দিয়ে। তারপর কাঁপা হাতে লিখলেন, 'বাবামশাই'। এটাই তাঁর জীবনের শেষ অক্ষরগুচ্ছ।

অপারেশনের পর কবির অবস্থা দ্রুত বদলাতে শুরু করল।

হাত-পা ঠান্ডা হতে লাগল। কাঁপতে লাগল শরীর। কিছু খাবার দিলেও আর খেতে রাজি হলেন না কবি। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভৃত্য বনমালী তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বসে বসে।

বনমালীর দু-চোখে অঝোরে জল পড়ছে। কবি অস্ফুটে বলছেন। পুরনো আলো সরে গিয়ে এবার দেখা দেবে নতুন আলো।

অপারেশনের সাতদিন পর থেকে ডা. বিধান রায় বললেন, মনে হয় বাঁচানো যাবে না। সেপটিসেমিয়া হয়ে গিয়েছে। আর আশা নেই। আস্তে আস্তে কথা বন্ধ হয়ে এল কবির। ইশারায়-ইঙ্গিতে কখনও হয়তো একটু কিছু জানান। বনমালী মুখে অল্প জল দিলেও খেতে পারেন না গড়িয়ে জল বাইরে পড়ে যায়।

অচেতন হয়ে পড়েন কবি। বাইরে শ্রাবণের অবিরাম ধারাপতনের শব্দ শোনা যায়।

বাড়ির বাইরে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। আস্তে আস্তে জোড়াসাঁকোর সামনেটা যেন জনসমুদ্রে পরিণত হতে থাকে।

সমুদ্র থেকে গর্জন ওঠে। কেমন আছেন? তিনি কেমন আছেন হাহাকার ভেসে আসে।

ঠাকুরবাড়ি নিশ্চুপ হয়ে ভিজতে থাকে। সেদিন একুশে শ্রাবণ, সেদিন রাতে ঠাকুরবাড়ির সদরের বাতি জ্বালা হয় না।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

কলকাতার বাবু সংস্কৃতিতে দুর্গাপুজো

দোয়েল দত্ত

সন্ধেবেলায় ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, মা দুর্গার সন্ধ্যারতি, আলো ঝলমলে ঠাকুরদালান আর রাত নামলেই বাইনাচের আসর, ঠুমরির মেহফিল, দেশীয় বাবুরা তো মজেছেনই, উপরন্তু ফিটন গাড়িতে একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন সাহেব-মেমরা— আর ততই ঝলমলিয়ে উঠছে দুর্গাষ্টমীর রাতের সুতানুটি, কলকাতা। এতটা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে চিত্রটা আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগের। যেকালে কলকাতা আর সুতানুটির জমিদার তথা বাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজোকে ঘিরে রয়ে গেছে কত মিথ, বাবুদের বিচিত্র শখ আর খামখেয়ালিপনার ইতিকথা। সেই পুরনো গন্ধমাখা বাবু সংস্কৃতিতে কেমন ছিল দুর্গোৎসব, আর তাতে ইংরেজদের ভূমিকা— সেই অন্বেষণেই আজ আমরা রত।

ইতিহাসের বিবর্ণ পাতা থেকে উঠে আসা তথ্য জানাচ্ছে, আনুমানিক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপুজো হয় কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে। পরিচালনার দায়িত্বে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। সেসময় কলকাতায় (সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর) বাঙালির এই প্রাণের উৎসবের অগ্রণী পথিক ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মীরা, আর তাঁদের যোগ্য সংগত দিতেন বাঙালি গোমস্তা, আমলা, মুনসিরা। এসময় ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসে ব্যবসার সনদ পেয়ে একশ্রেণির বাঙালি 'বাবু', বলা ভালো 'নব্যবাবু' সম্প্রদায় হঠাৎই ধনী হয়ে ওঠেন। আর তাঁদেরই বিলাসব্যসনের অন্যতম মাধ্যম ছিল দুর্গোৎসবের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা জাহির করার সুবর্ণ সুযোগ। বাবুদের শখের কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। এ-প্রসঙ্গে দুজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়— নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও শোভাবাজারের তালুকদার রাজা নবকৃষ্ণ দেব।

তৎকালীন বাংলায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুজোটিই ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল। শুধু নিজে নন, দুর্গাপুজো করার জন্য ধনী ব্যবসায়ীদেরও সমানভাবে উৎসাহ দিতেন নদিয়ারাজ। তবে সেই পুজোতে দেবীর ভক্তিকে ছাপিয়ে আমোদপ্রমোদ আর বিনোদনই হয়ে উঠত প্রধান মাধ্যম। মোদ্দা কথা হল, কালা আদমিরাও যে ইংরেজদের থেকে কোনও অংশে কম যান না, সেটা যেন তেন প্রকারেণ উপস্থাপিত করা। পুজোর উদ্বোধন হতো আষাঢ়ের ভরা বর্ষায় উলটোরথের দিন। কামানের গোলা ফাটানোর শব্দেই সকলে ওইদিন বুঝে যেতেন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। দেবী দুর্গা রায় পরিবারে পুরুষের বেশে অস্ত্রসহ, অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক সিংহরূপী বাহনের উপর দাঁড়িয়ে থাকতেন। প্রতিমা তৈরি হতো ১০৮ মণ মাটি দিয়ে, পাঁঠাবলি হতো, বিসর্জনে সামিল হতো গুনে গুনে ঠিক ১০৮টি গাড়ি। সমাজে বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণ আর শ্বেতাঙ্গ সমাজে নিজের 'স্টেটাস' বাড়তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম শারদোৎসবে বাইজি নাচের প্রচলন ঘটান।

এবার নদিয়া থেকে একটু সুতানুটির দিকে চোখ ফেরানো যাক। শোভাবাজারের তালুকদার রাজা নবকৃষ্ণ দেব ইংরেজদের হাতে সিরাজের পতনের জয়োচ্ছ্বাসের বাস্তবায়নেই যেন অনেকটা দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। সালটা ১৭৫৭। শোনা যায়, লর্ড ক্লাইভ দেববাড়ির পুজোতে ঝুড়িভর্তি ফল, নগদ অর্থ ও পাঁঠা বলিদানের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আজও যে-বাড়ির বনেদিয়ানা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নেন, তাহলে সে আমলে জৌলুসটা কেমন ছিল, তা অনায়াসে কল্পনা করাই যায়। ১০০১টি পশুবলি হতো ও কামান দেগে সূচনা হতো সন্ধিপুজোর সন্ধিক্ষণের। রাজা নবকৃষ্ণ স্বয়ং সমাদর করে বসাতেন বড়লাট, গভর্নর জেনারেল ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মীদের। দেদার খানা, অফুরন্ত পিনা আর চোখধাঁধানো বাইনাচের সম্মেলনে রাত ভোর হয়ে যেত। ক্লান্ত রাজা, পরিশ্রান্ত ইংরেজ কর্মচারীরা, তবুও যেন মনে হতো আমোদ আরও একটু চললেই-বা ক্ষতি কী, তোওফা, তোওফা। দুর্গোৎসবই তো, বাঙালির সবচেয়ে বড় পার্বণ– একটু বেশি হলে ক্ষতি কী। আসলে সেসময় দুর্গোৎসবের প্রাঙ্গণ ছিল ইংবেজ কর্মচারীদের সঙ্গে বাঙালিবাবু সম্প্রদায়ের সম্পর্কটাকে আরও মধুর করে তোলার একটা অবকাশমাত্র। পাশাপাশি ইংরেজ প্রভাবিত বাবু সংস্কৃতিও সমাজের আরও গভীরে তার শিকড় বিস্তার করে। পুজো যেখানে ছিল বাবু সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেখানে ইংরেজদের আমন্ত্রণ ও যোগদান যেন উভয়পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির এক অদৃশ্য নিয়ামক।

সেসময় আরেক প্রসিদ্ধ বাবু ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র। উত্তর কলকাতার কুমোরটুলিতে তাঁর পূজার আয়োজনের হইচই শুরু হয়ে যেতে প্রায় পনেরো দিন আগে থেকেই। দেবীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল রূপোর বিশেষ সিংহাসন। জোড়াসাঁকো মানেই মিথ। নাহ্‌, শুধু ঠাকুর পরিবার নয়, দাঁ পরিবারেরও সেকালে বেশ নামডাক ছিল। একটা বিষয় এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না, শুধু ইংরেজ নয়, পুজোকে কেন্দ্র করে সেকালে বাবুদের মধ্যেও ভালোরকম টক্কর হতো। গোবিন্দরামের রুপোর সিংহাসনের বার্তা দাঁ পরিবারে পৌঁছনোমাত্র কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ী শিবকৃষ্ণ দাঁ প্রতিমাকে মুড়ে দিলেন স্বর্ণালংকারে। দেবীর মুক্তো ও পান্না প্যারিস থেকে আনানো হতো। এই বাড়িতে শুধু সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাই নন, মেমদেরও পদধূলি পড়ত পুজোতে। পুজোর মূল উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে পানাহার আর ঝলমলে বাইনাচ যেন হয়ে উঠত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পুজোটা সেখানে নিতান্তই একটা উপলক্ষমাত্র। আস্তে আস্তে অবস্থা এমন হল যে বাঙালির ধনী পরিবারে পুজো হয়ে দাঁড়াল জাঁকজমক, নৃত্যগীত, পানভোজনের আর কে কত ভরি গয়না পরল তার প্রতিযোগিতার আসর। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর 'গভর্নমেন্ট গেজেট' পত্রিকায় লেখেন, 'বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়িতে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব মেমের সমাগমে ভোজ ও মদ্যপান হইয়াছিল। মুসলমান বাইজি ছাড়াও ব্রহ্মদেশীয় কয়েকটি নর্তকী ও গায়িকার আমদানি করা হইয়াছিল।' গোপীমোহন ছিলেন নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র, আর বলাই বাহুল্য বাবার জাঁকজমককে তিনি কয়েকগুণ বাড়িয়েছিলেন। মেডেল পাওয়া শহরের নামী বাইজি আর খেমটাওয়ালিরা হাজির হতেন বাবুদের মনোরঞ্জন আর চিত্তাকর্ষণের জন্য।

তবে সেসময় একটি বিষয় বেশ অদ্ভুত ছিল। এসব পুজোতে সাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রায় থাকতই না। এমনকী প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও কোথাও-বা জারি করা হতো কড়া নিষেধাজ্ঞা। আর নিম্ন মধ্যবিত্ত কালা আদমিদের তা 'জো হুজুর' বলে মানা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর থাকত না। শোভাবাজারে বারো দিন দরে চলা দুর্গোৎসবে সকলেরই প্রবেশ ও অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও পুজোর তিনদিন ইংরেজদের সামনে তাঁদের কিছুতেই যেতে দেওয়া হতো না। কেউ জোর করে ঢুকলে গালিগালাজ আর চূড়ান্ত অপমানে মনে হতো 'ধরণী দ্বিধা হও'। ধনীদের দুর্গাপুজোয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বলতে বোঝাত কুমোর, মালাকার, ঢালিসহ অন্যান্য সম্প্রদায়, যাঁদের সাহায্য ব্যতীত প্রতিমা নির্মাণ ছিল অসম্ভব। অথচ প্রাপ্য সম্মানের বেলায় লাভের গুড়টুকু খেতেন পূজারি ব্রাহ্মণ।

যে হিন্দুরা ইংরেজদের ছাপাখানায় মুদ্রিত বই গঙ্গাজলে ছিটিয়ে তবেই ঘরে প্রবেশ করাতেন, তাঁরাই কিনা মা দুর্গার পুজোতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অবাধ সুরাপানের ব্যবস্থা করেছিলেন! 'সত্য সেলুকাস বড় বিচিত্র এই দেশ।' কোথায় যেত তখন হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য? আসলে ইংরেজদের তাঁবেদারি, দেওয়ানগিরি, মুনসিগিরি করা এইসব বাবুরা সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদের মান-সম্মানকে কোথায় নামিয়েছিলেন, তা বোধহয় তাঁরা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারেননি। সেকালের সংবাদপত্রেও নৃত্যগীত সম্পর্কে লেখা হতো। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর 'সংবাদ ভাস্কর'-এ প্রকাশ, 'বাই খেমটাওয়ালি প্রভৃতি নর্তকীগণ দুর্গোৎসবের সময় বড় মানুষ বাবুদিগের বাটীতে স্বকীয়া মনমোহিনী বিশুদ্ধ তান, লয়, স্বরে গান করিয়া সকলের মনমোহন করিতে পারিবে এই নিমিত্ত সংগীতশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে... বারাঙ্গনাকুল দুর্গোৎসব উপলক্ষে চাতুরী করিয়া স্ব স্ব ক্রেতাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে।'

সাল ১৮১৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া হল নতুন সনদ। মিশনারিরা এদেশে এসে পূর্ণ উদ্যোমে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করবেন। তখনই ইংরেজ কর্মচারীরা যে হিন্দুধর্মের বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা করত তার বিরুদ্ধে সবব হন তাঁরা। ফলে দুর্গোৎসবে ইংরেজ সরকারি কর্মীদের যোগদান, হিন্দু উৎসব উপলক্ষে দুর্গ ও জাহাজ থেকে কামান দাগার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এমনকী ইংরেজদের উপরেও কড়া নির্দেশিকা নেমে আসে হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে না। এরপর ১৮৮০-তে আইন করে দুর্গোৎসবে ইংরেজদের যোগদান নিষিদ্ধ হয়। পুজোতে বাবুরা যেভাবে জলের মতো অর্থ অপব্যয় করতেন, বিনোদন করতেন, সেই অমিতব্যয়িতার জন্য তাতে তাঁদেরও দেউলিয়া হতে বেশি সময় লাগেনি। ফলত পারিবারিক পুজো ক্রমশই সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে।

ইতিহাসের বিবর্ণ পাতা থেকে উঠে আসা তথ্য জানাচ্ছে, আনুমানিক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দুর্গাপুজো হয় কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
কলকাতা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিপাশা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে একটা অন্যরকম উন্মাদনা। শহর কলকাতা তখন হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। কলকাতার পুজোগুলোর অন্যতম আকর্ষণ বনেদিবাড়ির পুজো। যেমন এর আভিজাত্য, তেমনই এর ঐতিহ্য। তাই কলকাতা সাপ্লিতে আজ থেকে শুরু হল...

বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

দুর্গাপুজোয় সধবা পুজোর প্রচলন রয়েছে বেহালার ‘সোনার দুর্গাবাড়ি’তে

বিপাশা চক্রবর্তী

বেহালার বনেদি বাড়িগুলির মধ্যে অন্যতম সোনার দুর্গা বাড়ির পুজো। সাবেকিয়ানা ও ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে বহু প্রাচীন এই পুজো বংশপরম্পরায় চলে আসছে। এই পুজোতে কুমারী পুজোর পাশাপাশি সধবা পুজোরও প্রচলন আছে। অতীত কাল থেকেই বাড়ির বয়োঃজ্যেষ্ঠ মহিলা বা পাড়ার কোনও সধবা মহিলাকে পুজো করার চল রয়েছে। সেই সঙ্গে এখনও বাড়িতে মল্লযুদ্ধের প্রচলন থাকার পাশাপাশি অলৌকিক ঘটনার কথা জানা গেল বাড়ির প্রবীণ সদস্য তপন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

বাড়ির রীতি অনুযায়ী, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ সোনার দুর্গা বাড়ির ঠাকুরদালানে এসে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন। অতীতেও তাই ছিল। কারণ তাঁরা মনে করেন মাকে দর্শন করার অধিকার সকলের আছে।

এই পরিবারের পুজো শুরু হওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। যশোহর নিবাসী জগৎরাম মুখোপাধ্যায় ব্যারাকপুরে সুখেই ঘরকন্না করছিলেন। বয়স তখন তিরিশ হবে, আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় সেই যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁকে গঙ্গার ঘাটে রেখে আসা হয়। পরে হঠাৎই তিনি আবার দেহে প্রাণ ফিরে পান। কিন্তু সেই যুগের রীতি অনুযায়ী পণ্ডিতেরা বিধান দেন যে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর আর এই পরিবারে স্থান হবে না। সামাজিক আচার-বিচারের কারণেই তাঁর আর ঘরে ফেরা হয়নি। অগত্যা গঙ্গার এ পারে এসে বেহালা চত্বরে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে অযোধ্যা হালদারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেখানেই তিনি বসবাস শুরু করেন। সালটা ১৭৭০। জগৎরামের চার ছেলে ও একমাত্র আদরের কন্যা জগত্তারিণী প্রত্যেকবারের মতো সে বছরও গেছেন মামার বাড়ির দুর্গাপুজায়। কিন্তু আদরিণী মেয়ের মনে হল সেখানে তাকে যেন কিছুটা অবহেলা করা হচ্ছে। অভিমান করে বাড়ি ফিরেই বাবাকে জানালেন সেও বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করতে চায়। তাও আবার এই বছরেই। সে দিন ছিল অষ্টমী। মেয়ের জেদের কাছে নতি স্বীকার করে পরদিনই ঘট পেতে পুজো করলেন জগৎরাম। মায়ের ভোগ হিসাবে ছিল কলাইয়ের ডালের খিচুরি। সেই থেকে বেহালায় এই পুজো শুরু হয়।

জগৎরামের নাতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মসূত্রে ঢাকায় থাকাকালীন ঢাকেশ্বরীর মূর্তি দেখে ঠিক করলেন, কলকাতার বাড়িতে সেই আদলে সোনার দুর্গামূর্তি গড়বেন। কিন্তু শুধু সোনার তৈরি প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না বলে অষ্টধাতু সংযোগে মাতৃমূর্তি স্থাপন করলেন ১৮৬৯-এ। তারপর থেকে চলে আসছে দুর্গাপুজো। সোনার প্রতিমার চালচিত্র অষ্টধাতুর তৈরি। এই চালচিত্রের মধ্যেই থাকেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। এই মূর্তিগুলোও অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি।

বেহালায় মুখোপাধ্যায় পরিবাবের বাস প্রায় দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। মেয়েকে খুশি রাখতে যে-পুজো শুরু হয়েছিল সেই ধারা চলে আসছে এখনও। পুজোর সময়ে কলাইয়ের ডালের খিচুরি ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়। দুপুরে ভাত-ভোগ দেওয়া হয়। রাতে দেওয়া হয় লুচি ভোগ। এছাড়া প্রচুর সন্দেশ সহযোগে নৈবেদ্যর থালা সাজানো হয়। দুর্গা মাকে যে ভাত ভোগ দেওয়া হয়, তাতে থাকে শুক্তো, আট রকমের ভাজা, ফুলকপির তরকারি, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, ছেঁচকি, ঘন্ট, শোল মাছ পোড়া, চাটনি ও পাপড়।

পুজো শুরু হয় মহলয়ার দিন তর্পণের মধ্যে দিয়ে। ঠাকুর দালানে তর্পণের মাধ্যমে পিতৃপুরুষকে জল দেওয়া হয়। তারপরই শুরু হয়ে যায় চণ্ডীপাঠ। পুজোর কয়েকটা দিন সংস্কৃত শ্লোক, মন্ত্রোচ্চারণ, ঢাকের বাদ্যি সহযোগে মায়ের আরাধনা চলে। মাকে সুন্দর সুন্দর সোনার গয়নায় সাজানো হয়।

দুশো বছরেরও বেশি সময়ের পুরনো এই মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। এ-বাড়িতে অষ্টমীর দিন নয়, কুমারীপুজো হয় নবমীর দিন। এর পিছনেও রয়েছে এক বিশেষ কারণ। কুমারী পুজো ঘিরে এক অলৌলিক ঘটনা রয়েছে।

কোনও এক সময় অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর আগে যে কুমারী মেয়েকে পুজো করার কথা ছিল সে হঠাৎই উধাও হয়ে যায়। অনেক খোঁজখবর করেও মেয়েটির আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। কিন্তু মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার পর দেখা যায় মায়ের মুখের সামনে লাল রং। সকলে মনে করেন ওই মেয়েটিকে মা নিয়ে নিয়েছেন। এরপর থেকে মুখোপাধ্যায় বাড়িতে বন্ধ হয়ে যায় কুমারী পুজো। পরে এলাকার লোকেদের উদ্যোগে ফের কুমারীপুজো চালু করার জন্য পণ্ডিতদের কাছে বিধান চাওয়া হয়। তাঁদের কাছ থেকে বিধান পাওয়ার পর কুমারী পুজো ফের চালু করা হয়। তবে শুধুমাত্র নবমীর দিন। সেই থেকে মুখোপাধ্যায় বাড়িতে নবমীর দিনই হয় কুমারীপুজো।

দশমীর দিন মাকে অশ্রুজলে বিসর্জন দেওয়া হয়। তবে এদিন এই পরিবারের রীতি অনুযায়ী ভোগ হিসাবে দেওয়া হয় পান্তাভাত। সঙ্গে কচুর ঘন্ট, মাছপোড়া আর চালতার অম্বল। কৈলাসের পথে পাড়ি অর্থাৎ বাড়ির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তাই তাঁকে দেওয়া হয় দই, খই, মুড়কি ও চিঁড়ে। বিসর্জনের রীতি অনুযায়ী মাকে বাড়ির মেয়ে হিসাবে বরণ করে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হয়। তবে মায়ের মূর্তি মন্দিরে পূজিত হয় সারাবছর ধরে। ঘট ও কলাবউ বিসর্জন দেওয়া হয়।

মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে দশমীতেও। এখানে ঘট ভাসান দেওয়ার পর বৈঠক ভৈরবের পাঠ শুরু হয়। তারপর বাড়ির প্রত্যেকেই দুর্গানাম লেখেন। এরপর ১০ থেকে ১২ জন পণ্ডিতদের দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের পায়ের ধুলো নেওয়া হয়। সেখানে বাড়ির বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বাড়ির ছেলেমেয়েরা মল্লযুদ্ধে অংশ নেন। সেই শুরুর সময় থেকেই এই প্রথাও চলে আসছে। আজও অতীতের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে দুর্গাপুজো করে চলেছে জগৎরাম মুখোপাধ্যায়দের পরিবার।

ফোটো: লেখিকা

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

সোশ্যাল মিডিয়ার চরম দাপটেও কলকাতার চায়ের ঠেক এখনও নটআউট

ইমন মুখোপাধ্যায়

সেও এক সময় ছিল যখন দেশের ও বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোই হতো তিলোত্তমার চায়ের ঠেকের আড্ডায়। গাওস্কর থেকে জ্যোতি বসু সবারই চুলচেরা বিশ্লেষণ চলত পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানগুলিতে। ভারত ভাগ ঠিক না ভুল, সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের কারণ কী তা স্রেফ কয়েক মিনিটের বোলচালেই ঠিক করে দিতেন পাড়ার স্বঘোষিত সর্বজ্ঞরা। তবে ইদানীং একটা বিতর্কের জন্ম নিয়েছে। কালের করালগ্রাসে নাকি সেসব দৃশ্য ইদানীংকালে অনেকটাই বিরল। তরুণ প্রজন্মের অনেককেই নাকি আর আগের মতো টানে না চায়ের ঠেকগুলি। তারা তাঁদের যাবতীয় মতামত প্রকাশের আধার হিসাবে বেছে নেন সোশ্যাল মিডিয়াকেই। সেখানেই চলে বিতর্ক, সেই থেকেই জন্ম নেয় ঘৃণা। তৈরি হয় প্রেম। মন কষাকষি হলে আনফ্রেন্ড। বিশ্বায়নের যুগের হুজুগে কেমন যেন অচেনা হয়ে গিয়েছে প্রাণের শহরটা। ব্র্যান্ড সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মেকি ব্যাপার চলে এসেছে এ-যুগের বাঙালির। আংশিক সত্যি হলেও, এই তত্ত্ব পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ চায়ের দোকানের আড্ডা, এ-শহরের ঐতিহ্য। মার্কস, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো এই শহরের রক্তে মিশে আছে সেই আড্ডা। বয়স্করা এখনও আড্ডা ও বিতর্কের জন্য চায়ের দোকানকেই বেছে নেন। মাঝে মধ্যে নকল শিং লাগিয়ে বাছুর হয়ে গরু সেজে তরুণরাও জুটে যান তাঁদের সঙ্গে। তারপর আবার সেই অভিজ্ঞতা সেলফিতে ডুবিয়ে পোস্টও করেন ফেসবুক-ট্যুইটারে। কারণ কলকাতা মানে আমবাঙালি। তাঁর প্রিয়তম পানীয় অবশ্যই চা।

না না। কোনও ঝাঁ-চকচকে কফিশপ কিংবা সফিস্টিকেটেড টি শপের কথা বলছিলাম না। বলছিলাম একেবারেই রাস্তার ধারের কিংবা পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানের কথা। যেগুলি প্রায়ই পরিচিত দাদার দোকান, বউদির দোকান, মামা-কাকা-পিসির চায়ের দোকান নামে। মাটির ভাঁড়ে করে দুধ, চিনি, পাতা মেশানো কড়া চা কিংবা স্পেশাল মালাই চা। লেবু, বিটনুন সহযোগে লিকার চা কিংবা পাড়ার ডায়াবেটিক দাদাদের জন্য আলাদা করে চিনি ছাড়া পানসে লিকার। সকাল-বিকেল চায়ের দোকান নামক আড্ডার ঠেকের মোহটাই আলাদা। বাঙালি নাকি অনেক বেশি হুজুগে আর আড্ডাপ্রিয়, গঠনমূলক কাজের থেকে তাঁদের ঢের বেশি নজর গঠনমূলক আলোচনার দিকে। অর্থাৎ কাজের কাজ হোক ছাই না হোক, চায়ের কাপে ঝড় তাঁকে তুলতেই হবে। সুখী বঙ্গজাতির এই বদনামটা তো আর নতুন নয়। দেশের কূটনীতি থেকে ঘরের রাজনীতি, চার মাথা এক হলে সবই কেমন আটকা পড়ে যায় চায়ের দোকান নামক এই চক্রব্যূহে। সুতরাং পরিবর্তনের যুগেও চায়ের আড্ডার ঐতিহ্যটা কিন্তু চলে আসছে প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই।

তা সে যে কোনও চায়ের ঠেকই হতে পারে। সাদা বাংলায় চায়ের দোকান। চেনা চায়ের গ্লাসে চড়া গলায় কিঞ্চিৎ ঝড় উঠবেই। চায়ের ঠেক-ই ঠিকঠাক জানাবে, ব্যাটে বিরাট কোহলির কোথায় ভুল হচ্ছে, সুইং-এ মহম্মদ শামির, অভিনয়ে শাহরুখের, অর্থনীতিতে অমর্ত্য-র...।

আর চায়ের দোকানের মালিক মানেই পাক্কা এক-একটা নাটকের চরিত্র। ওঁরা কমবেশি তিন গোত্রের। একদল আছেন বয়েস নির্বিশেষে, সাক্ষাৎ সক্রেটিস। মহাজ্ঞানী এবং কম কথার মানুষ। সর্বদা ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত বিড়ি বা সিগারেট। শেষ মন্তব্যটি তিনিই করবেন এক অবিশ্বাস্য উচ্চতা থেকে। বিষয়টা বনলতা থেকে বোমারু বিমান অথবা জাতীয় বিদেশ নীতি হলেও!

আরেক দল সানাইবাদকের শাগরেদের মতন। খদ্দের লক্ষ্মী যা বলেন, তিনিও সেই সুরেই বাজেন। অন্য আরেক দল অত কথকতায় নেই। দেখলে মনে হয়, ল্যাবরেটরির ঝানু গবেষক। দুধ-চিনি-জলের অনুপাতটাই তাঁদের ধ্যান, জ্ঞান, জীবনের চৌহদ্দি। সিঁথি থেকে শিবপুর। বেলেঘাটা থেকে বারুইপুর। পাটুলি থেকে পোস্তা— বৃহত্তর কলকাতায় অন্তত বারোশো বাইশটা বাজার বসে। শুধু এ কটা বাজার ধরলেও মাথাপিছু অন্তত তিনটে চেনা চায়ের দোকান। এ ছাড়া স্টেশন-বাসস্ট্যান্ড হাসপাতাল-মল-লেক-গলি-তস্য গলি সর্বত্র চায়ের ঠেক। পাশাপাশি জুড়ে দিলে দিল্লি ইস্তক চলে যায়।

কলকাতার চায়ের ঠেক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আর সাদ্দার স্ট্রিটের মানিক চাঁদ মাহাতোর চায়ের কথা বলব না? তা কোথায় এটি? এসপ্ল্যানেড মোড় থেকে হগ মার্কেটের দিকে যেতে টাইম গেস্ট হাউসের ঠিক সামনেই পড়বে সাদ্দার স্ট্রিটের ইংরেজ আমলের এই ঐতিহ্যশালী চায়ের ঠেক। দেখতে সাদামাটা জৌলুসবিহীন হলে কী হবে, মোকা কফি কিংবা জাফরানি চায়ের লা জবাব স্বাদটা পেতে হলে আপনাকে আসতেই হবে এই দোকানে। এই দোকানের আরও একটা বিশেষত্ব কি জানেন? কেটলির বদলে অন্যান্য সব আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় চা তৈরিতে! দুধ, কফি, ক্রিম, চকলেটের সংমিশ্রণে তৈরি এখানকার মোকা চা কিন্তু কলকাতা বিখ্যাত! তার সঙ্গে পাবেন টোস্ট অমলেট, আদা চা, মধু চা, লেবু চা, মশলা চা আরও কত কী! শরীর সচেতনরাও ঘাবড়াবেন না। মধু সহযোগে গ্রিন টিও পেয়ে যাবেন এখানে। সুতরাং দলবল নিয়ে মানিক চাঁদ মাহাতোর দোকানে একবার চলে এলেই জমে যাবে চায়ের আড্ডাটা।

আর যদি দুটি পাতা-একটি কুঁড়ির চা বেশি পছন্দের হয় তাহলে যেতে পারেন সিমপার্ক মলের ঠিক বিপরীত ফুটপাথের মধ্যবিত্ত গোছের চায়ের দোকানগুলিতে। ঠিক এই গোছেরই আরেকটি দোকান পেয়ে যাবেন স্কুপের গলিতেও।

এই অঞ্চলের খুব কাছেই রয়েছে ডেকার্স লেন। আর ডেকার্স লেন মানে? ঠিক ধরেছেন! চিত্তদার চায়ের দোকান। বহু বছরের পুরনো এই দোকানে যাননি এমন ভোজন বা চা-রসিক বাঙালি খুব কমই আছেন। শুধু চা না, চিত্ত দা-র চিকেন স্টু আর ঘুগনিও এক্কেবারে লা-জবাব! এখান থেকে আর একটু এগোলেই প্যারাডাইস সিনেমা হলের কাছে চোখে পড়বে হালফিলের গজিয়ে ওঠা 'ফালতু টি শপ'। নামে ফালতু হলেও এখানকার চা আর ডিম-পাউরুটি কিন্তু ফালতু নয় মোটেও!

চা-পাউরুটি সমেত আড্ডা মারার আরেকটা প্রসিদ্ধ স্থান হল ৬৯বি সূর্য সেন স্ট্রিটের ফেভারিট কেবিন। ১৯১৮ সাল থেকে চলে আসা এই আপাত সাদামাটা চায়ের দোকানে একসময় বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে স্বদেশি আন্দোলনকারী, সাহিত্যিক, অভিনেতা অনেকেই এসেছেন ঘুরে-ফিরেই। দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা নূতনচন্দ্র বড়ুয়া এবং গৌড়চন্দ্র বড়ুয়া যে কেবল স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলির গোপন মিটিংয়ের ঠেক হিসাবেও ব্যবহার করতেন এই চায়ের দোকানটিকে। কড়া চা, ডিম টোস্ট আর প্যান কেকের সাথে আজও সান্ধ্যকালীন আড্ডাটা কিন্তু জমিয়েই বসে এখানে। একবার এলেই এই ফেভারিট কেবিন নাকি হয়ে ওঠে সকলের ফেভারিট। এমনটাই মনে করেন দোকানটির বর্তমান মালিকও।

কলেজ জীবনটা যদি কাটে সেন্ট জেভিয়ার্সে তাহলে নিশ্চয়ই রাজু আর ছটুর চায়ের দোকানগুলি ভালোই চেনা আপনার! খুব বেশি পুরনো না হলেও এঁদের চা, কচুরি, সিঙারা মন জয় করে নিয়েছে খাদ্য আর আড্ডাপ্রিয় বাঙালির।

লেক মার্কেটে আশি বছরের পুরনো রাধুবাবুর চায়ের দোকান যেমন! লিকার-ফ্লেভার চা তো বটেই, চাইলে কবিরাজি, ফিশ ফ্রাই, কাটলেট, মটন স্টু বা কোর্মাও মেলে। এক সময় কিমা কারি, পুডিংও পাওয়া যেত। ভোর ছ'টা থেকে দশটা, বিকেল তিনটে থেকে সাড়ে আটটা, আজও শুধু চায়ের বিক্রি এখানে কম সে কম এক হাজার কাপ ছাড়িয়ে যায়।

তাই সোশ্যাল সাইটগুলি যতই নিজের বপু বিস্তার করুক না কেন, চায়ের দোকানের আড্ডার ভাত সে কোনওদিনই মারতে পারবে না। অন্তত যতদিন এই শহরের বুকে প্রাণ আছে, ততদিন তো নয়ই।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

অশরীরী @ কলকাতা

কারা কাঁদে উড়ালপুলের নীচে

সোমনাথ আদক ও তন্ময় মণ্ডল

কলকাতা মানেই, কোথাও মাথার ওপর মাকড়সার জালের মতো বিছানো উড়ালপুল, তো কোথাও কোনওরকমে একজন ঢুকতে পারার মতো এঁদো গলি। কলকাতা মানেই, কোথাও বহুতলের উপচে পড়া ভিড়, ভিড় ছাপিয়ে মাল্টিস্টোরেড হাইরাইজের একাধিপত্য তো কোথাও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— মাথার ওপর ভরসা এক টুকরো ছেঁড়া প্লাস্টিক। কলকাতা মানে, ফুটপাথ দখল করা দোকান, দরদাম, বিকিকিনি। ব্যস্ততা, গুজব, আড্ডা। আর কলকাতা মানে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বা ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র। আর এই বৈচিত্রময় ঐক্যের মধ্যে তারা থাকবেন না, তা কি হয়? কিন্তু প্রশ্ন হল তারা কারা? তারা কি সবাই আমার আপনার মতো মানুষ? নাকি অন্য কেউ? অন্য কিছু?

উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকায় এখন একটু কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায়, লোকের মুখে মুখে ঘোরা এই প্রশ্নগুলোই। আর শুধু এলাকাবাসীই-বা কেন খবরটা তো এখন হাওয়ার থেকেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতায় এবং কলকাতা ছাড়িয়ে শহর থেকে শহরতলিতে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? বাসে-ট্রামে-মেট্রোয় কী বলছে সবাই? তবে কি পুরোটাই গুজব? নাকি এই গুজবের আড়ালে লুকিয়ে আছে সত্যিই কোন রোমহর্ষক কাহিনী?

৩১ মার্চ, ২০১৬-বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২:২০। এক বিকট আওয়াজে সারা কলকাতাকে কাঁপিয়ে ব্যস্ত রাস্তার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে বিবেকানন্দ উড়াল পুল। মুহূর্তের এই বিপর্যয় একদিকে যেমন নির্বিচারে কেড়ে নিয়েছিল নারী, পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ তেমনই থমকে দিয়েছিল গিরিশ পার্কের গণেশ টকিজ এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের জীবন। নিহতদের তালিকায় স্কুলপড়ুয়া থেকে বৃদ্ধ, পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে ভিন রাজ্যের গাড়ির ড্রাইভার— বাদ ছিল না কেউই। সেদিন উড়ালপুল বিপর্যয়ের পর আহত, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষদের সাহায্য করতে স্থানীয়রাই এগিয়ে গিয়েছিল। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে জল চেয়েছিল বলেও শোনা যায়।

সেই বিপর্যয়ের পর কেটে গেছে এক বছরেরও কিছু বেশি সময়। সরেছে ধ্বংসস্তূপ, কিন্তু পোস্তার স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে এখনও রয়ে গেছে সেই দুর্ঘটনার ক্ষত। আতঙ্ক, আর্তনাদ, মৃত্যু সব মিলিয়ে জন্ম দিয়েছে এক অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনির। শোনা যায়, এখনও নাকি গণেশ টকিজ এলাকায় দিনে রাতে কোনও কোনও আগন্তুক স্থানীয় বা কোনও বাসিন্দাদের কাছে জল চায়। আগন্তুককে জল দিতে গিয়ে অনেক সময় তাদের চোখ তো চড়কগাছ। জল চেয়ে চোখের নিমেষে আগন্তুক উধাও। কোথায় গেল আগন্তুক? প্রশ্ন রয়েছে, উত্তর নেই। গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এমন অভিজ্ঞতার তালিকায় আছেন ট্যাক্সিচালক থেকে অটো ড্রাইভারও। কেউ কেউ বলেন, গণেশ টকিজ এলাকা থেকে অটো বা ট্যাক্সিতে যাত্রীকে তুলেছেন কিন্তু কিছুটা এগিয়ে পিছন দিকে খেয়াল করতেই চালকের গলা শুকিয়ে কাঠ। পিছনের সিট ফাঁকা। যাত্রী হাওয়া। চলন্ত গাড়ি থেকে কোথায় গেলেন? কী করে গেলেন? এক্ষেত্রেও প্রশ্ন আছে। তবে কি...! উত্তর নেই।

এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আজও রাত বাড়লেই ভেঙে পড়া ব্রিজের নীচ থেকে কারা যেন কাঁদে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আর্তচিৎকার করে। জল চায়। যেমনটা ঠিক তারা শুনেছিল বিবেকানন্দ উড়াল পুল ভেঙে পড়ার দিন। কিন্তু দেখা যায় না কাউকে। তবে কারা ওরা?

রাজশেখর বসু তো সেই কবেই বলেছেন, 'এই কলকাতা শহরের রাস্তায় যারা চলা ফেরা করে-কেউ কেরানি, কেউ দোকানি, কেউ মজুর, কেউ অন্য কিছু। তোমরা ভাবো সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের মধ্যে দু-চারটে ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর।'

তবে কি সত্যিই এমন কিছু আছে? ধুলো আর কংক্রিটের শহরে আকাশে-বাতাসে প্রশ্ন আছে। আছে, রহস্যের ইন্দ্রজাল। তবে উত্তর নেই। নেই কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

তথ্য @ কলকাতা

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.banglarmukh.com)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (www.wbprd.nic.in)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (www.wbfin.nic.in)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbhealth.gov.in)
- **পরিবেশ দফতর** (www.enviswb.gov.in)
- **পূর্ত দফতর** (www.pwdwb.in)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (www.vahan.wb.nic.in)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.wbagrisnet.gov.in)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbiwd.gov.in)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (www.coopwb.org)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbfisheries.gov.in)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbard.gov.in)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (www.wbfood.gov.in)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbsed.gov.in)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (www.tathyabangla.gov.in)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (www.wbyouthservices.in)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbsc.gov.in)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (www.wbdma.gov.in)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (www.mssewb.org)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbpower.nic.in)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (www.wbreda.org)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.wbmdfc.org)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (www.anagrasarkalyan.gov.in)

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার - ২৪৫৬৭০০১, ২৪৫৬৭০০৫

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২৫৫৫৭৬৭৬, ২৫৫৫৭৬৫৬

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২২৪৪৩২১২, ২২৪৪৩২১৭

পিয়ারলেস হসপিটাল - ২৪৬২২৩৯৪, ২৪৬২২৪৬২

উডল্যান্ডস - ২৪৫৬৭০৭৯, ২৪৫৬৭০৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান - ২৪৭৫৩৬৩৬, ২৪৭৫৩৬৩৮

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

চারিদিকে ইতিহাসের গভীর ছাপ

কণিকা রায় (আবৃত্তিকার)

কলকাতা শব্দটার ভেতর একটা অন্যরকম টান অনুভব করি। কলকাতার একটা অন্যরকম আন্তরিকতা আছে, আছে সবাইকে আপন করে নেওয়ার প্রবণতা। আমিও অনেক কিছু পেয়েছি এই শহর থেকে। এ-শহর ঢাকার মতোই আমার মনের খুব কাছের শহর।

আমি প্রথম কলকাতায় যাই একটা অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসদন চত্বরে সেই অনুষ্ঠান ছিল দুই বাংলার বাচিকশিল্পীদের একত্রিত করে একটা অসাধারণ উপস্থাপনা। আমরা বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলাম ন'জনের একটা টিম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে। পার্ক স্ট্রিট মানেই একটা আলোর রোশনাই জমজমাট ব্যাপার। সেটা ওখানে পা রেখেই বেশ বুঝতে পারছিলাম। যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম তারপরের দিনই ছিল আমাদের প্রোগ্রাম। তাই প্রস্তুতির একটা তোড়জোড় ছিলই। তারমধ্যেও একটু ঘুরে দেখে নিলাম আশপাশটা। সর্বত্রই একটা ঝাঁ-চকচকে ব্যাপার।

পরদিন অনুষ্ঠানে পৌঁছলাম। ওপার বাংলার ব্রততীদি থেকে চন্দ্রমৌলি, কে নেই সেই অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যায় শেষ হল সেই অনুষ্ঠান। আমি পাঁচটি কবিতা উপস্থাপন করলাম। দর্শকের মধ্যে যে উন্মাদনা, যে ভালোবাসা পেয়েছি তা কখনও ভুলতে পারব না। রবীন্দ্রসদনের পাশেই বিড়লা তারামণ্ডল, ভিক্টোরিয়া। কিন্তু সেদিন সময়ের অভাবে দেখা হল না। ট্যাক্সি ধরে পৌঁছলাম ফের হোটেলে। পরের দুটো দিন ঠিক হল আমাদের কলকাতা ঘুরে দেখার জন্য। তারপরের দিন সকালের ফ্লাইটে ফিরব।

সকালে উঠেই আমরা বেরোলাম কলকাতা ঘুরতে। প্রথম গন্তব্যই ছিল প্রিন্সেপ ঘাট। সকালের গঙ্গা যে কি মেদুর, যে দেখেনি তাকে বলে বোঝানো যাবে না। সেখানেই আমাদের ব্রেকফাস্ট হল সেদিনকার। অনেকটা সময় কাটালাম। পার্ক স্ট্রিট দেখেছি তবে এখানে এসে মনে হচ্ছিল এ যেন এক অন্য পৃথিবী। একেবারে অন্যরকম কলকাতা। সেখান থেকে একটু বেলা বাড়লে আমরা গেলাম যাদুঘর দেখতে। পুরাতনের এই সংগ্রহশালা মনোমুগ্ধকর। এরপর ঠিক হল আমরা ভিক্টোরিয়া যাব। সেখানে গিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমিও আমার যৌবনে ফিরে যাচ্ছি। আমারও বয়স কমে গেছে বছর কুড়ি। আর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা যতই বলি ততই কম হবে। কলকাতার রাস্তায় এত জ্যাম, এত ঘিঞ্জির রেশমাত্র নেই এখানে। ভাবাই যায় না কলকাতা শহরটার ভেতরে এতটা জায়গা জুড়ে এত বড় একটা পার্ক আছে। সুন্দর সুন্দর গাছ-গাছালিতে ভরা। যেমন খুব সুন্দরভাবে এদের পরিচর্চা করা হয়, তেমনি এখানকার মিউজিয়াম। সেখান থেকে বিড়লা মিউজিয়াম,

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। সেই দিনটা এভাবেই ঘুরে ঘুরে কাটল।

তারপরের দিন আমরা ঠিক করলাম একবার যখন কলকাতা এসেছি কলেজ স্ট্রিটটা দেখেই যাব। দুপুরের পর গেলাম কলেজ স্ট্রিট। সেখানেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সেই কফি হাউস। আমরা গেলাম কফি হাউসে অনেকটা সময় কাটালামও। মান্নাদের সেই গানটা শুনেই প্রথম কফি হাউসের সাথে আলাপ আমার। চাক্ষুষ সেখার পর সে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আর এখানের বইয়ের মার্কেটের কথা যত বলব, ততই কম বলা হবে। এ এক বিপুল ভাণ্ডার। এখানে এসে দেখালাম সেই কলকাতা ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ। চারিদিকে ইতিহাসের গভীর ছাপ।

কলকাতা শহরে আর কখনও যাওয়া হয়নি তবে ওখানকার মানুষের আন্তরিকতা, আলাপ-ব্যবহার সত্যিই আজীবন মনে থাকবে। সময় সুযোগ পেলে আবারও যাব প্রিয় শহরে।

ফোটো: প্রীতম চক্রবর্তী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রতীপ হালদার

একদিন এক মেছো দোকানদার বলছে, 'লিখেছে বেশ, কার লেখা গো?' আর একজন বলে উঠল, 'খেস্টান মধুর। জাত খোয়ানো ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি মধুসূদন দত্ত। যশোরের রাজনারায়ণ দত্ত। তাঁর কুপুত্তর জিশু ভজেছে।' সেই লোকটি বলল, 'কিন্তু লিখেছে বেশ।' তারপর দোকানদার মুখস্থ বলতে শুরু করল, 'সুমিত্রা শ্বাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী; কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে...'

১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাস। হঠাৎ মহা সোরগোল উঠল। জোয়ারে জোয়ার তুলল কলকাতা তথা ভারতবর্ষে। যশোরের রাজনারায়ণ দত্তের কুপুত্তর খেস্টান মধুর আহা কী যশ! কারণ মহাকাব্য অর্থাৎ 'মেঘনাদবদ কাব্য' নিয়ে হঠাৎই হইচই দেখা গেল। চিরাচরিত পাশ্চাত্যের একঘেয়ে কালচার ছেড়ে, প্রাচ্যের ঠুনকো অনুভূতির এক তীব্র মোহময় আবেগের অনুরণন সৃষ্টির আলোড়ন যিনি এনেছেন তিনিই মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সালটা ১৮২৪, ২৫ জানুয়ারি, অধুনা বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে কাটিপাড়ায় জন্ম হয় তাঁর। ছোটবেলা থেকে মাতা জাহ্নবী দেবী ও মৌলবি লুৎফুল হক ছিলেন বেড়ে ওঠার শিক্ষক। তাঁর বয়স তখন ন' বছর। ১৮৩৩ সাল। সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে

খিদিরপুর স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে রাজনারায়ণ দত্ত হিন্দু কলেজে জুনিয়র স্কুল বিভাগে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। এরপর ইংরেজি সাহিত্য যেন তাকে এক অদ্ভুত নেশার আসক্তিতে গ্রাস করে ফেলল ধীরে ধীরে।

১৮৪৩ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ওই বছরই ওল্ড মিশন চার্চে গিয়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু পাদরি ডিলট্রি তাঁর মাইকেল নামকরণ করেন। মধুসূদন দত্ত পরিচিত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর বিধর্মী পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন শিবপুরের বিশপস কলেজে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যান। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে পরিত্যাগ করলেও, বিশপস কলেজে পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। চার বছর পর তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করেন। বিশপস কলেজে কয়েকজন মাদ্রাজি ছাত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে যখন কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন মধুসূদন। তখন তাঁর সেই মাদ্রাজি বন্ধুদের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে যান চাকরির খোঁজে। শোনা যায় আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে সেই টাকায় মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তিনি।

মাদ্রাজে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের চেয়েও কবি যে বিশেষ কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করা। মাদ্রাজে থাকাকালীন তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিশ নামক এক ইংরেজ যুবতীকে বিয়ে করেন। অরফান আস্যাইলাম স্কুলে পড়াতে শুরু করার পরই তাঁর পরিচয় হয় রেবেকার সাথে। বিদেশিনীকে বিয়ে করা থেকে এই সবই হয়েছিল মাদ্রাজ পৌঁছনোর ছ'মাসের ভিতরে। কিন্তু তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট, গোলমাল দেখা দিল। মাইকেলের একগুয়েমির কারণে স্ত্রীর মতের সাথে অমিল হতে লাগল। এর ফলে তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই রেবেকার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। রেবেকার গর্ভে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়।

মাদ্রাজ জীবনের শেষপর্বে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অল্পকাল পরে মধুসূদন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক শিক্ষকের কন্যা হেনিরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসি তরুণীকে বিয়ে করেন। হেনিরিয়েটা মধুসূদনের সারাজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁদের নেপোলিয়ান নামক এক ছেলে এবং শর্মিষ্ঠা নাম এক মেয়ে হয়েছিল। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ।

কবি যখন ইংল্যান্ডে আইন বিষয়ে পড়তে গিয়েছিলেন, সেখানের আবহাওয়া এবং বর্ণবাদিতার কারণে বেশিদিন ইংল্যান্ডে থাকেননি। তারপর তিনি ১৮৬০ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে চলে যান। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ ছিল। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আর্থিক সাহায্যের জন্যই তিনি তাঁর আইন বিষয়ে পড়া শেষ করে ভারতে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইংরেজি সাহিত্যে বিভিন্ন কারণে সাফল্য না পেয়ে বাংলা সাহিত্যে মনোনিবেশ করলেন তিনি। এরপর সৃষ্টি হল একের পর এক অনবদ্য রচনা। ১৮৬০ সালে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন— 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী' নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনিই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। আবার একই ছন্দে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এরপর একে একে রচিত হয় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতা' (১৮৬৬), 'হেক্টরবধ কাব্য' (১৮৬৭) ইত্যাদি। ১৮৬১-এর মার্চ মাসে তৎকালীন নিষিদ্ধ দুশো পৃষ্ঠার 'নীলদর্পণ' নাটকের অনুবাদ মাত্র একরাতে সম্পন্ন করেন ইংরেজিতে। লন্ডনের সিম্পফিন মার্শাল নামে একজন প্রকাশক এই নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ করেন।

মধুসূদনের শেষজীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আইন ব্যবসাতেও তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহাকবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে জন্মভূমির প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে গেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিমালায়। যেটি আজও তাঁর সমাধিস্থলে খোদিত আছে—

'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে!
তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে...'